চলচ্চিত্রং চলৎবিত্তম্

সজনীকান্ত দাস

১৯২৮ সনে তিন শত পঁচিশ টাকা সম্মান - দক্ষিণা দিয়া বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের পত্তনের দ্বারা যেদিন লেখক হইতে প্রকাশক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই, সেদিন কলিকাতার একটি বৃহত্তম পুস্তক - প্রকাশ - প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তা পথের পাঁচালী প্রকাশের ঘটনাটি হয়তো সামান্য, কিন্তু তাহা পরবর্তী কালে বাঙালী - লেখক- জগতে সুবৃহৎ ফল-সম্ভাবনার সূচনা করিয়াছিল। সেকালের এক রকম রেওয়াজই দাঁড়াইয়াছিল পঞ্চাশ হইতে এক শত টাকা মূল্যের বিনিময়ে প্রকাশকের নিকট গ্রন্থের সর্বস্বত্ব বিক্রয়ের। এক শত টাকা পাইতেন স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান লেখক। পঞ্চাশ টাকাই ছিল সাধারণ ভদ্র দর। পথের পাঁচালীর পর হইতেই হাওয়া বদলাইয়াছে। আজকাল নিতান্ত হতভাগ্য নেশাখোর লেখক ছাড়া কেহই ওই মূল্যে কপিরাইট বিক্রয়ের কল্পনাও করেন না।

চলচ্চিত্রে বাঙালী লেখকদের মূল্য নিপণ ব্যাপারে আমিই অনুরূপ বিপর্যয় ঘটাইয়াছিলাম। সে কাহিনী বলিতেছি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের নীহারিকা বা প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিরঞ্জন পাল, হিমাংশু রায়, পি. গুহ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চা রায় (পত্নী মায়া রায় সহ) প্রমুখ পায়োনীয়ারগণকে হিসাবের মধ্যে ধরিতেছি না। বাংলা চলচ্চিত্র-নির্মাণে সর্বাধিক প্রতিভাধর বড়ুয়া সাহেব (প্রমথেশ বড়ুয়া) ও সর্বাধিক ক্ষিপ্র দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চারার ডি. জি. কেও (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, পত্নী প্রেমলতিকা দেবী সহ) ওই দলেই ফেলিতেছি। ঐতিহাসিক যুগে প্রথম মুখর চলচ্চিত্র ঋষির প্রেমের লেখক কবি কৃষ্ণধন দে না - অর্থ না - যশ কোন দিক দিয়াই লাভবান হন নাই--- তাঁহাকেও সেই মাত্র পঞ্চাশ টাকার কপিরাইট বিক্রয়ের দুর্ভোগ সহিতে হইয়াছে। তিনি এতাবৎকাল প্রায় দুই ডজন ছবির গল্প- লেখক, অথচ সিনেমা বিলাসীরা তাঁহার নামের সঙ্গে পরিচিত নন। তিনি দরিদ্র লেখক বলিয়াই অবহেলায় চাপা পড়িয়াছেন।

বর্ধমান হইতে তণ লেখক শ্রী দেবকীকুমার বসু বিপুল উদ্যম, অসাধারণ অধ্যবসায় ও এক বাণ্ডিল স্ক্রিপ্ট বগলে যেদিন কলিকাতার চলচ্চিত্র জগতে উদিত হইলেন, সেই দিন নূতন ইতিহাসের সূচনা হইল, দুর্গাদাস - উমাশশীর অভিনয় - সাফল্য - মণ্ডিত চণ্ডীদাসে দেবকীকুমারের ঐকান্তিক একলব্যীয় সাধনা জয়যুক্ত হইল। কিন্তু তিনি সাহিত্যের সাধক রহিলেন না, সরাসরি চলচ্চিত্রের সেবক হইয়া গেলেন।

১৯৩০ সনের মধ্যে অনেকগুলি চলচ্চিত্র - প্রতিষ্ঠান যদিও কলিকাতায় ও ঢাকায় কাজ আরম্ভ করিয়াছিল এবং বিগ্রহ কণ্ঠহার প্রভৃতি চিত্রের যৎসামান্য নামও হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সাহিত্যিকদেরর পক্ষে ওই নূতন শিল্পের লোভনীয় আকর্ষণ ছিল না বলিলেই হয়। ওই সনের ২০ ডিসেম্বর শনিবার রাধা ফিল্মের শ্রীকান্ত লইয়া চিত্রা চিত্রগৃহের পত্তন এবং পরে নিউ থিয়েটার্সের জন্মলাভে বাংলা চলচ্চিত্র - জগতে নূতন উৎসাহ ও উদ্যমের সঞ্চার হয়। বাঙালী কথা - সাহিত্যিকেরা ধীরে ধীরে স্বল্পমূল্যেই সিনেমা - শিল্পের পায়ে আত্মনিবেদন করেন। কল্লোল তখন স্তব্ধ, দল ছিন্নভিন্ন। সম্পাদক ডি. আর. অর্থাৎ দীনেশরঞ্জন দাশ অচিরাৎ শিল্পীবন্ধু চা রায়ের অনুসরণে স্টুডিও শিল্পের উৎকর্ষ বিধানে ব্রতী হইয়াছেন, শৈলজানন্দ প্রবল অধ্যবসায় সহকারে সমালোচনার খিড়কি - পথ দিয়া সদরে মাথা গলাইবার প্রয়াস করিতেছেন। সাহানা প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তদানীন্তন চলচ্চিত্রগুলির বিদ্ধে এক দিকে যখনতিনি তীব্র সংগ্রাম চালাইতেছেন, অন্য দিকে তখনই গঠনমূলক চিত্রনাট্য রচনার মক্‌শও করিতেছেন। শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্র - দেবতা তাঁকে কৌশলে কুক্ষিগত করিয়া স

ামান্য দাক্ষিণ্যে তাঁহার বাম হস্তখানি নিষ্পিয় করিয়া দিলেন। শৈলজানন্দ পূরাপূরি চলচ্চিত্রায়িত হইয়া গেলেন। কালি - কলমের সহযোগী প্রেমেন্দ্রও তাঁহার অনুগমন করিতে বিলম্ব করিলেন না। তাহার পর একে একে নবীন বহু সাহিত্যিকই সিনেমা - তীর্থে কিম্বদন্তী - বর্ণিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত হয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন, না হয় মহাকবি কালিদাসের ন্যায় হয়োভূত্বা চিঁহিশব্দং চকারয়েৎ।

বলা বাহুল্য, আমাকেও বার কয়েক ঘোড়া বানিয়া চিঁহি - চিঁহি করিতে হইয়াছে। প্রথম সংযোগ ঘটে ১৯৩০ সনের ১৫ই নভেম্বর তারিখে--- প্রবাসী-র ছাপাখানা- ম্যানেজারের ছোট্ট ঘরখানিতে বসিয়াই যেদিন চলচ্চিত্র-সাপ্তাহিক চিত্রলেখা বা হির করি। মুবিব ছিলেন শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। শুনিয়াছিলাম -- পরবর্তীকালের চলচ্চিত্র - ধুরন্ধর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারেরও গোপন হস্ত এই উদ্যোগের পিছনে ছিল। আমাকে নানা কারণে অন্তরালে থাকিতে হইয়াছিল, সম্পাদকরূপে মাসিক দশ টাকা বেতনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রথাগ্রে স্থাপন করিয়াছিলাম,লাগাম অবশ্য আমার হাতেই ছিল। আঠার সপ্তাহ চিত্রলেখা চালাইয়া তদানীন্তন স্বল্পপরিধিসম্পন্ন চলচ্চিত্র ব্যাপারে প্রায় লায়েক হইয়া উঠিয়াছিলাম। ত ারপর সেই বঙ্গশ্রীর আমলের ব্যাপার, শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কল্যাণে গোটা ১৯৩৪ সন ধরিয়া কমপক্ষে দুই শতখানি বিদেশী ছবি দেখিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল বুঝি চিত্রনাট্যরচনার যাবতীয় টেকনিকই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি। হেমন্তকুমার শ্রীনীতীন্দ্র বসুর সহিতও আমার সংযোগ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন,কিন্তু সেই সংযোগ ফলপ্রসূ হয় নাই। আমার বিদ্যা অপরীক্ষিতই থাকিয়া গিয়াছিল।

১৯৩৭ সনের মাঝামাঝি কালে শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় যেদিন প্রমথেশ বড়ুয়াকে সঙ্গে লইয়া আমার ২৫।২মোহনবাগান রো-স্থিত আপিস, ছাপাখানা এবং বাসভবনে উপস্থিত হন, তৎপূর্বে সচিত্র ভারত নামক সাপ্তাহিক পত্রে (আর্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত) আমি আর একবার সমসাময়িক চলচ্চিত্রে কড়া কড়া সমালোচনা লিখিয়া সিনেমা - সংক্রান্ত হস্তকণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করিয়াছিলাম। নিউ থিয়েটার্সের উপরেই একটু বেশী কোদাল চালাইয়াছিলাম। সেই নিউ থিয়েটার্সের প্রখ্যাত প্রযোজক এবং প্রচারসচিবকে সশরীরে মদ্‌গেহে উপস্থিত হইতে দেখিয়া একটু চকিত হইয়াছিলাম বই কি! পাকা শিকারী প্রমথেশব াবু, ধানাই - পানাই বা আমড়াগাছির অবকাশমাত্র দিলেন না, একেবারে স্থিরলক্ষ্যে গুলি ছুঁড়িলেন। বলিলেন, আমার পিতার জমিদারিতে কিছু বনজঙ্গল এবং কয়েকটা হাতী আছে, পরবর্তীছবিতে সেগুলিকে কাজে লাগাইতে চাই। গল্পটা হইবে একজন আর্টিস্টের দুঃখময় জীবনের। তিনি মুখে মুখে খানিকটা গল্পও বলিয়া গেলেন এবং আমাকে দুই দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গল্পটি খাড়া করিতে বলিলেন। ঠিক দুই দিনের দিন বৈকালে আমাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া লইয়া বড়ুয়া স াহেব নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওর গোলঘরে হাজির করিলেন। সায়েব অর্থাৎ শ্রী বি. এন. সরকার সেখানে বার দিয়া বসিয় াছিলেন। শান্ত স্বল্পভাষী মানুষ--- আমার গল্প পড়া হইলে ছোট্ট একটি কথা বলিলেন, ভাল। বড়ুয়া সাহেব চিত্রনাট্যের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য গল্পটি আমার নিকটহইতে লইয়া বলিলেন, তাঁহার কাজ হইয়া গেলেই পাত্রপাত্রীদের মুখের কথা অর্থাৎ সংলাপ আমাকে বসাইয়া দিতেহইবে। কয়েকটি গান রচনারও ফরমাশ দিলেন। গল্পটির নাম দিয়াছিলাম মুক্তি -- সেই বৎসরের একটি সাময়িকপত্রের কোনও বিশেষ সংখ্যায় তাহা প্রকাশও করিয়াছিলাম। সংলাপ ও গান লিখিতে বেশীদিন দেরি হইল না। আর পুরা চারিটি ও তিনটি গানের অংশবিশেষ বড়ুয়া সাহেব গ্রহণ করিলেন, রবীন্দ্রন াথের ও অজয় ভট্টাচার্যের গানও কয়েকটি লওয়া হইল। কাজ হইয়া গেলেই আমাকে নিউ থিয়েটার্সের ধর্মতলাস্থিত আ পিসে উপস্থিত হইতে বলা হইল। সেখানে শ্রীসতীনাথ ঘোষ, বর্তমানে নন্তুদা-র, মুসাবিদায় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। গল্প, সংলাপ ও সাতখানি গানের সর্ববিধ স্বত্ব (মায় রেকর্ড) বেচিয়া সাকুল্যে পাঁচ শত টাকা পাইয়া আমি আনন্দে ডগমগ হইয়া ঘরে ফিরিলাম।আমাকে মাত্র একদিনের জন্য শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের আহ্বানে সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া গানের দুই - একটি কথাবদলাইবার জন্য স্টুডিওতে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। বাস্, ওই পর্যন্ত। ১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বরের মাঝ ামাঝি মুক্তিমুক্তিলাভ করিল ওই চিত্রা - গৃহে এবংং সঙ্গে সঙ্গে আশাতীত জনপ্রিয়তা অর্জন। অজয় ভট্টাচার্যের কোন্ লগনে এবং আমার ওগো সুন্দর --- এই গান দুইটি পথে - ঘাটে বনে- বাদাড়ে সর্বত্র শ্রুত হইতে লাগিল। আমার গানটি নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী কানন দেবী গাহিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কি না ইহা লইয়া বহুতর্কবিতর্ক ও বাজি - ধরাধরি হইয়াছিল। শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক উহার স্বরলিপিও প্রচার করিয়াছিলেন। চলচ্চিত্র ব্যাপ ারে আমার প্রথম প্রচেষ্টা প্রায় ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করিয়াছিল যে রচনাটির কল্যাণে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম

ওগো সুন্দর,
মনের গহনে তোমার মুরতিখানি
ভেঙে ভেঙে যায়, মুছে যায় বারে বারে
বাহির-বিশ্বের তাই তো তোমারে টানি।।
ওই যে হোথায় আকাশের নীলে
বনের সবুজ এক হয়ে মিলে
ওই যে হোথায় সাগর - বেলায় ঢেউ করে কানাকানি---
ভেঙে ভেঙে যায় মুছে যায় বারে বারে
বাহির - বিশ্ব তাই তো তোমারে টানি।।
তোমার আসন পাতিব পথের ধারে,
তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।
আঁধারে আলোকে যুগ যুগ ধরি প্রিয়,
বিরহে ভেঙে যায় মুছে যায় বারে বারে
বাহির - বিশ্ব তাই তো তোমারে টানি।।

এই গানের রেকর্ড বহু সহস্র বিক্রয় হইয়াছে, আমার ভুল করো না পথিক গানটিও গ্রামোফোন - রেকর্ড মারফত কম জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই, কিন্তু লেখকের ভাগ্যে প্রাপ্তির অঙ্ক সেই পাঁচ শতই রহিয়া গিয়াছে।

মুক্তির এই অভিনব সাফল্য অবিলম্বে প্রখ্যাত ডি. জি. - কে আমার দিকে আকৃষ্ট করিল। তিনি হাল - বাংলা নামীয় একটি কাহিনীর খসড়া আমার নিকট হাজির করিলেন, সংলাপ ও গান রচনা করিতে হইবে। বড়ুয়া সাহেব যে চিত্রনাট্য - মেড-ঈজি পদ্ধতি শিখাইয়াছিলেন তাহাতে আমার যথেষ্ট সাহস জন্মিয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও পাঁচ টাকার চুক্তিতে কাজ আরম্ভ করিলাম, গান লিখিয়া দিলাম সতেরটি। কাজ শেষ হইল, কিন্তু ডি. জি. বারম্বার আমার প্রাপ্যবিষয়ক চুক্তি ভঙ্গ করাতে আমি সংলাপ আটক করিলাম। স্মরণ হইতেছে ১৩৪৫র বঙ্গাব্দে (১৯৩৮) ৯ই ভাদ্র অর্থাৎ আমার জন্মদিনে হঠাৎ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণকে আমি নির্ব্যূঢ়স্বত্বে গান সংলাপ সমস্তই দান করিয়া আনন্দ ও মুক্তিলাভ করিলাম।

সাহিত্যিকের পক্ষে চলচ্চিত্রে দাক্ষিণ্যের পরিমান তখন এইরূপই ছিল। শৈলজা - প্রেমেন্দ্রও সামান্য মাস - মাহিনার কাজ করিতেন এবং সাহিত্য - বোধহীন কর্তৃপক্ষের অনুশাসন মানিতে বাধ্য হইতেন বলিয়া তাঁহাদের মানসিক যন্ত্রণার শেষ ছিল না। ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাসে এই লাঞ্ছনার শোধ তাঁহারা উভয়েই যথেচ্ছভাবে তুলিতে পারিয়াছেন, এইটুকুই স্বান্ত্বনা।

সামান্য মাস - মাহিনায় বন্দী হইবার জন্য বোম্বে টকিজ হইতে তারাশঙ্করেরও আহ্বান আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রসারিত বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছিলেন। মাসিক বেতনের বন্ধন ঘুচিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি আজিও চলচ্চিত্র ঝিন্দের বন্দী হইয়াই আছেন।

সংক্ষেপে যে ইতিহাস দিলাম, তাহাতে খুঁটিনাটির একটু - আধটু ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য মূল কথাটা সত্য। দ্বিতীয় বিশ্ব - মহাযুদ্ধের প্রায় সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র - শিল্পে সাহিত্যিকেরা উপযুক্ত সম্মান লাভ করেন নাই। চিত্রনির্মাতা ও তাঁহাদের নিযুক্ত প্রযোজক সম্প্রদায় তখন নিজেদের শিল্প - সাহিত্য - বুদ্ধিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান করিয়া দম্ভ ও আত্ম প্রত্যয়ের আকাশদূর্গে বিহার করিতেন। মৃত বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের চাহিদা ছিল শুধু তাঁহাদের নামের বিজ্ঞাপন - মূল্য হেতুই। তাঁহাদের গল্প, বাচন ও কথোপকথন - ভঙ্গীর উপর বানিয়া বুদ্ধির লগুড়াঘাত করিতে চিত্রনির্মাতাদের দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। সাহিত্যবুদ্ধিহীন বেতনভোগী চিত্রনাট্যরচয়িতাদের স্থূল হস্তাবলেপ সাহিত্য - রসিকদের মুহুর্মুহু ক্ষুণ্ণ করিত। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক চাহিদায় বাজে রদ্দি মালও অবাধে বিকাইত। কাকতালীয় অর্থপ্রাপ্তির বিপুল সাফল্য চিত্রনির্মাতারা সবটাই নিজেদের কেরামতির খাতে জমা করিয়া আত্মগর্বে স্ফীত হইতেন এবং ঘোষণা করিতেন ও সাহিত্যিকের ধার আমরা ধারি না, আমরা কায়দা করিয়া যাহা দিব, জনসাধারণ তাহাই গোগ্রাসে গিলিবে। তাঁহারা বিদেশী ছবি, বিদেশী গল্প ও দেশীয় রসিকতা তিলেতিলে আহরণ করিয়া তিলোত্তমা ছবি নির্মাণ করিতেন, গল্প ও

সংলাপ - রচনায় সাহিত্যনীতির কোনও মূল্য দিতেন না। কবরের শব প্রাণবন্ত ও দৈত্যবলে বলীয়ান হইয়া যখন স্বয়ং ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত হইলচিত্রনির্মাতারা বুঝিতে পারিলেন, ডিরেক্টরদের খোশখেয়ালের জোড়াতাড়া - দেওয়া কাহিনী এবং ইংরেজীগন্ধী সংলাপ আর চলিবে না--- কাহিনী ও সংলাপ রচনার কাজে কৃতী সাহিত্যিকদের সহযোগিতা অনিবার্যভাবে আবশ্যক। এমন কি, সাহিত্য - সম্রাটের সাম্রাজ্য চলচ্চিত্রে বজায় রাখিতে হইলে জীবিত সাহিত্যিকদের লিপি - অনুশাসন প্রয়োজন। কর্তাদের এই বিলম্বিত সদ্‌বুদ্ধির ফলেই চলচ্চিত্র - জগতে সাহিত্যিক অনুপ্রবেশ (ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন) সম্ভব হইয়াছিল। শৈলজানন্দ- প্রেমেন্দ্র - শরদিন্দুকে গোড়ায় পশ্চাদ্দারপথে প্রবেশের দুঃখ সহিতে হইয়াছে, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহারা এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী সাহিত্যিকেরা সদরের সম্মান লাভ করিয়াছেন।

১৯৪৫ সনে এপ্রিল মাসের জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আমরা -- সদ্য - প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘের কর্মীরা -- নৃত্যগীতবহুল অভ্যুদয় নাটকের অভিনয় লইয়া মাতিয়াছিলাম। ওই নাটকের অভাবনীয় সাফল্য আমাদিগকেও যথেষ্ট খ্যাতি দান করিয়াছিল। নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করিবার সময় নামজাদা দেশকর্মীরা বদ্ধ ছিলেন। বৎসরের শেষের দিকে তাঁহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিলেন এবং অভ্যুদয় দেখিয়া কংগ্রেস - সাহিত্য - সংঘকে সম্বর্ধিত করিলেন। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেহের বিশেষ অধিবেশন বসিবে, কংগ্রেস - কার্য - নির্বাহক-সমিতির সদস্যদের অভ্যুদয় দেখাইবার জন্য আমরাও বিশেষ তোড়জোড় করিতেছিলাম। হঠাৎ বুড়োদা অর্থাৎ শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী সংবাদ দিলেন--- শ্রীনীতীন্দ্র বসু বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, জরী প্রয়োজনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেচান। এগারো বৎসর পূর্বে ১৯৩৪ সনে চলচ্চিত্র সম্পর্কে ইনিই আমাকে সর্বপ্রথম তাতাইয়া দিয়া গা-ঢাকা দেন। সুতরাং সংবাদ শুনিয়া কৌতুহল ও কৌতুক দুই-ই বোধ করিলাম।

সাক্ষাৎ হইল। বোম্বে টকিজ লিমিটেড রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবির মুখর ছবি তুলিতে চান---হিন্দী বাংলা উভয় ভাষায়। চিত্রনাট্যরচনার ভার তাঁহারা আমাকে দিতে চান। মহৎ আদর্শ ও জাতীয় কল্যানের পটভূমিকা রচনা না করিয়া নীতীন্দ্র বসু কোনও কথা বলেন না। আমার সুবিধা অসুবিধার কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার পূর্বেই তিনি মনোহারী বচনের তোড়ে আমাকে এমনই অভিভূত করিয়া ফেলিলেন যে, আমার অজগর - কবলিত হরিণের অবস্থা হইল, পালাইবার বা না বলিবার ক্ষমতা রহিল না। অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক অভিনয়ই আমার সর্বাধিক বাধা, কিন্তু প্রাপ্তির অঙ্কের আঘাতে সে বাধা অপসারিত হইতে দেরি হইল না। সেও এক ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি---একেবারে পাঁচ অঙ্কের ব্যাপার। পর্বতসানুদেশলগ্ন গ্লেসিয়ারের মত আমার বিগলিত ও নিম্নাভিমুখী অবস্থা ঘটিল, রাজী হইয়া গেলাম।

শ্রীহিতেন্দ্র চৌধুরীর সহিত চিঠিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়া ডিসেম্বরের গোড়াতেই বোম্বাই পৌঁছিলাম এবং একেবারে সরাসরি নগরোপান্তবর্তী মালাড-গ্রামে স্টুডিও - ভবনে অধিষ্ঠিত হইলাম। আমার চলচ্চিত্র - সম্পর্কিত জ্ঞান তখনও বড়ুয়াসাহেবকৃত শর্ট-ডিভিসন পর্যন্ত। ওই বিদ্যা লইয়াই হাতে - কলমে মুক্তি ও হাল - বাংলার সংলাপ লিখিয়াছিলাম। মনে মনে ধারণা ছিল বাংলাদেশের প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার হইতে ইহার অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, এখানে এই ক্ষেত্রে অশিক্ষিতপটুত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ ছাড়পত্র। কিন্তু একটা গোটা উপন্যাসকে চিত্রনাট্যায়িত করিতে বসিয়াদেখিলাম, বড়ুয়া - বিদ্যা কোন কাজেই লাগিতেছে না। শেষ পর্যন্ত নিজের সহজবুদ্ধিতে একটা পদ্ধতি খাড়া করিলাম। বইখানি বার বার পড়িয়া ও বিশ্লেষণ করিয়া মূল চরিত্রগুলিকে বাছাই করিয়া লইলাম এবং উপন্যাসের ধারা ধরিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রের কাহিনী রচনা করিলাম। স্মরণ আছে বিশ্লেষণকালে অর্ধশতাধিক অসঙ্গতি চোখে পড়িয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ কথার পরে কথা সাজাইয়া যে ছবি ফুটাইয়াছেন, ছবি দিয়া সেই ছবি ফুটাইতে গেলেই অসঙ্গতি ধরা পড়িবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। বিবাহান্তে একই ঝড়ের রাত্রে দুই বরপক্ষ একই নদীতে নৌকা - বহরে স্বস্ব স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। রমেশ এক বর, নলিনাক্ষ আর এক বর। রমেশের বধূ সুশীলার মাতা বরপক্ষের সহযাত্রিনী হইয়াছেন, নলিনাক্ষের স্ত্রী কমলার তিনকুলে কেহ নাই, সে একক স্বামীর অনুগামিনী। রাত্রে জলে নৌকাডুবি হইল। ভোরে দেখা গেল পদ্মার চরে রমেশ ও কমলা পাশাপাশি পড়িয়া আছে। কমলা যদি সুশীলা অর্থাৎ রমেশের বধূ হইত তাহা হইলে জ্ঞান হইবামাত্র সে সর্বপ্রথম মা মা বলিয়া কাঁদিত। কমলা যখন তাহা করিল না তখনই রমেশের বুঝা উচিত ছিল, বধূটি তাহার নয়। সে কমলাকে লইয়া গ্রামে পৌঁছিল, সেখানে তাহার পিতার শবদেহ পাওয়াগেল এবং শ্মশানে দাহও হইল অথচ নববধূর মাতার প্রসঙ্গও উঠিল না, ইহা কি করিয়া সম্ভব? সম্ভব এইজন্য যে সে প্রসঙ্গ উঠিলে গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবির ভরাডুবি হইত, সেইখানেই মামল

ার নিষ্পত্তি হইয়া যাইত।
এইরূপ বহু অসঙ্গতিতে নৌকাডুবি ভরা। ছবিতে দেখাইতে গেলেই দর্শককে তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইবে, কথার ফুলঝুরির মোহ ছবিতে টিকিবে না। মহা সমস্যায় পড়িলাম। এই সকল সমস্যা সমাধানে নীতীন্দ্র বসু আমার একমাত্র সহায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে পরামর্শ করিয়া একটা সঙ্গতিপূর্ণ চিত্রনাট্য খাড়া করিলাম। তাহাই বাংলা নৌকা-ডুবি এবং হিন্দী মিলন চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। চিত্রনাট্য রচিত হইলে বিশ্বভারতী - কর্তৃপক্ষের সমর্থন আমাকেই আনিতে হইয়াছিল। আমি শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে পরিবর্তনের কারণগুলি দেখাইয়া দিতেই তিনি ছাড়পত্র দিয়াছিলেন।
এই বোম্বাই - সফরে আমার আর একটি মোহমুক্তি হইয়াছিল। স্টুডিওর অভ্যন্তরে কিছুকাল বাস করিয়া ও কিছুদিন অবিরত যাতায়াত করিয়া আমি বহুবর্ণ বিচিত্র ও সুশোভিত আসুন বসুন -- লেখা চলচ্চিত্র - আসনের উল্টা পিঠটাও দেখিয়া ফেলিয়াছিলাম। ম্যাজিসিয়ানের সহকারী হইলে ম্যাজিকের মোহ কাটিয়া গিয়া খেলা দেখিয়া যেমন দর্শকদের বোকামিতে হাসির উদ্রেক হয়, চলচ্চিত্রের ফাঁকি কি ভাবে লক্ষ লক্ষ দর্শককে বাস্তবের ধোঁকা দিয়াবিভ্রান্ত করে তাহাও দেখিবার ও শিখিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সিনেমার পাহাড় - পর্বত নদী - সমুদ্র অরণ্য - নগর ঝড় - জল মেঘ - বিদ্যুতের বিচিত্র ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়া সুখী হইতে পারি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন-- চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য হয় না। চালাকির দ্বার মহতীজনতাকে মোহমুগ্ধ করিয়া যে তাহার সর্বস্ব অপহরণ করা যায় সিনেমা থেকে প্রমাণ করিয়াছে। ছায়ার প্রতারণা বুদ্ধিমান মানুষকে প্রত্যহ অবশ ও নির্বুদ্ধি করিতেছে।
যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম। আমারই পঞ্চাঙ্ক- প্রাপ্তির পরেই বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি চলচ্চিত্রদেবতার মুক্তহস্ত দাক্ষিণ্যের সঞ্চার হয়। একটি কৌতুককর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত এই যে, যে নিউ থিয়েটার্স ১৯৩৭ সনেমুক্তির গল্প - সংলাপ - গানের জন্য আমাকে ৫০০ টাকা দক্ষিণা দেন, তাঁহারাই ১৯৫০ সনে পরিত্রাণ চিত্রের মাত্র দুইখানি গানের জন্য আমাকে ওই ৫০০ টাকাই প্রদান করেন। শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, সর্বত্রই এই বর্ধিত হার প্রবর্তিত।
আরও এক শিক্ষা বাকি ছিল, ১৯৪৭ সনে তাহাও লাভ করিলাম। নৌকাডুবিতে বড় উপন্যাসকে সঙ্কুচিত করিয়া দুই ঘন্টার পরিধিতে আনিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল, কলিকাতার এস. বি. প্রডাকশনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প দৃষ্টিদান কে দুই ঘন্টার মত টানিয়া লম্বা করিতেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এ ক্ষেত্রেও শ্রীনীতীন্দ্র বসু সহায়ক ছিলেন। কয়েকটি নূতন চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করিয়া সে পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম অর্থাৎ বিশ্বভারতীর পাসমার্কা পাইয়াছিলাম। এস. বি. প্রডাকশন আমার চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সুতরাং নূতন শিক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফলের মুদ্রিত প্রমাণ আছে।
১৯৪৮ সনে বম্বে টকিজের পক্ষে শ্রীনীতীন্দ্র বসু আবার ডাক দিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রজনীকে চিত্রনাট্যরূপ দিবার জন্য। ইহাও বড় উপন্যাসকে সঙ্কুচিত করার জন্য, কিন্তু নৌকাডুবির আদর্শে সে কাজ করা গেল না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সকল গল্পই নিজের জবানিতে বলিয়াছেন, শুধু ইন্দিরার জবানি এবং রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রের জবানিতে কাহিনী শুনাইয়াছেন। এইগুলির অধিকাংশই মনের কথা। সামান্য ঘটনা --- ফুলের গন্ধ, হাতের স্পর্শ অথবা কণ্ঠের স্বরকে কেন্দ্র করিয়া এক এক কাঁড়ি ভাবনা। বিভিন্ন চরিত্রের কথা মিলাইয়া এক করিতে গিয়া দেখি, হাজারো অসঙ্গতি। ভাবনা ও অসঙ্গতিকে ছবিতে রূপ দেওয়া যায় না। কাজেই অনেক অদল - বদল করিতে হইল। শেষ পর্যন্ত গল্প এমন দাঁড়াযইল যে, বই ও পাত্রপাত্রীর নাম ছাড়া বঙ্কিমের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। আমি দেবকীকুমার বসু কর্তৃক চিত্রায়িত চন্দ্রশেখরের অ-বঙ্কিমত্বে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম। রজনীকে অতখানি পরিবর্তনের ধাক্কা সহিতে দিলাম না। অমরনাথকে সমরণাথ করায় তাহারই নামে বইয়ের নামে বইয়ের নাম রাখিলাম সমর, তরঙ্গময়ীর (লবঙ্গলতা) সহিত তাহার বুদ্ধির যুদ্ধের প্রতিও ওই নামের মধ্যে ইঙ্গিত রহিল। গোড়ায় একটি কৈফিয়ৎও যোগ করিয়া দিলাম। সমরের হিন্দী রূপের নাম হইল মশাল।
১৯৪৫ সন হইতে আজ পর্যন্ত জীবিত সাহিত্যিকদের উষর ক্ষেত্রে চলৎচিত্র হইতে অনেক বিত্ত গড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু গলৎ - এর কথা এই যে অধিকাংশ স্থলেই তাহা চলৎ - বিত্তম্। তবুও পূর্বে যেমনটি হইত, জাতি -কূলমান দিয়াছি তবু পেট ভরে নাই-- এমনটি আর হইতে পায় নাই। একটা কথা স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে,এই তীর্থে মাথা মুড়াইয়া অথবা হামাগুড়ি দিয়া ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যিকদের লাভ হইতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পকে আশ্রয় করিয়া বাংলা সা

হিত্যের কোন উন্নতিই হয় নাই, হয়তো বিপরীতই ঘটিয়াছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com